সম্পাদকীয়

editorialamarbarta@gmail.com

মুঠোফোনে ঋণের ফাঁদ

অবৈধ অ্যাপের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন

মোবাইল অ্যাপকেন্দ্রিক ঋণের ফাঁদ যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তাতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে নাগরিকেরা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না; বিপুল অঙ্কের টাকাও বিদেশে পাচার হয়ে যাবে। বাংলাদেশের আইনে অনুমোদনহীন ঋণ বিতরণ নিষিদ্ধ হলেও ব্যক্তি পর্যায়ে জরুরি ও সহজ ঋণের যে চাহিদা রয়েছে, তার সুযোগই নিচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপ। প্রথম আলোর অনুসন্ধানে ঋণভিত্তিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িত সক্রিয় অন্তত ৩০টি অবৈধ অ্যাপের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতার হার একেবারেই অনুল্লেখ। এ ছাড়া ডিজিটাল অপরাধের ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর জানাবোঝা, সক্ষমতা ও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে নাগরিকের তথ্য ফাঁস, ডার্কওয়েবে নাগরিকের জীবনবৃত্তান্ত বিক্রি থেকে শুরু করে অনলাইন জুয়া, অনুমোদনহীন মুদ্রা লেনদেন বা ফরেক্স ট্রেডিং, ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের মতো ডিজিটাল অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

> দেশে বৈধভাবে ঋণ দেয় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। অবৈধ অ্যাপের মাধ্যমে ঋণের ফাঁদকেন্দ্রিক প্রতারণা বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায় এটা এরই মধ্যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এসব দেশে এই ধরনের ঋণের ফাঁদে পড়ে নাগরিকদের সর্বস্বান্ত হওয়া থেকে শুরু করে আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। অ্যাপকেন্দ্রিক ঋণ নেওয়া কয়েকজন ভুক্তভোগীর যে গল্প উঠে এসেছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে তাঁরা বড় ধরনের ...

দেশে বৈধভাবে ঋণ দেয়া ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। অবৈধ অ্যাপের মাধ্যমে ঋণের ফাঁদকেন্দ্রিক প্রতারণা বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কায় এটা এরই মধ্যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এসব দেশে এই ধরনের ঋণের ফাঁদে পড়ে নাগরিকদের সর্বস্বান্ত হওয়া থেকে শুরু করে আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

অ্যাপকেন্দ্রিক ঋণ নেওয়া কয়েকজন ভুক্তভোগীর যে গল্প উঠে এসেছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে তাঁরা বড় ধরনের প্রতারণার শিকার হয়েছেন। ৬ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে কাউকে এক মাসের মধ্যে ১০ হাজার টাকা শোধ করতে হয়েছে। আবার কাউকে ২৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৫৪ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, ঋণের অ্যাপগুলো মুঠোফোনে ইনস্টল করলে মুঠোফোনের সব নম্বর এবং ছবি, ভিডিওসহ অন্যান্য তথ্য অ্যাপ পরিচালনাকারীদের হাতে চলে যায়। আবার ঋণের আবেদনের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি ও মুঠোফোনে আর্থিক সেবা নম্বর দিতে হয়। এসব ব্যক্তিগত তথ্যই শেষ পর্যন্ত অ্যাপ পরিচালনাকারীদের প্রতারণার অস্ত্র হয়ে ওঠে। ঋণের বিপরীতে কয়েক গুণ অর্থ দাবি করে মুঠোফোনে থাকা ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, আত্মীয়স্বজনের নম্বরে ফোন দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ডিজিটাল আর্থিক প্রতারণা বিশ্বজুড়েই একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত এপ্রিলে দেওয়া মার্কিন বিচার বিভাগের এক বিবৃতিতে জানা যাচ্ছে, কম্বোডিয়া, লাওস ও মিয়ানমারের সীমান্তে অনলাইন প্রতারক চক্রের আখড়া হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সক্রিয় ঋণ পরিচালনাকারী অ্যাপগুলোর কোনো ঠিকানা ও কার্যালয় নেই। সেগুলো দেশের ভেতরে নাকি বাইরে থেকে পরিচালিত হচ্ছে, সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যায়। ফলে এর মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। ফেসবুক বিজ্ঞাপন ও গুগল প্লে স্টোরে এসব অ্যাপ রয়েছে এবং তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এরই মধ্যে এসব অ্যাপ কয়েক লাখ বার ডাউনলোড হয়েছে। বড় সংখ্যক নাগরিক যখন অ্যাপ থেকে ঋণ নিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন এবং দেশ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, অ্যাপে অবৈধ ঋণদানের বিষয়টি জানা নেই। এ বক্তব্য প্রমাণ করে শুধু নাগরিক নন, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ডিজিটাল অপরাধের ব্যাপারে এখনো যথেষ্ট সচেতন নয়। সম্প্রতি ভারত অবৈধ ঋণ প্রদানকারী অ্যাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। আমরা মনে করি, ঋণ প্রদানকারী অ্যাপের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ডিজিটাল প্রতারণার এই ভয়ংকর ফাঁদ থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা ও তাঁদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

সুনামগঞ্জ-জামালগঞ্জ সড়ক

গাছ কাটা থেকে সরে আসুন

সুনামগঞ্জ-জামালগঞ্জ সড়কের দুই পাশের হাজার হাজার গাছ কাটার উদ্যোগ গভীর উদ্বেগজনক। পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্রমবর্ধমান বিপর্যয়ের সময়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আরও উদ্বেগের বিষয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে এক হাজারের বেশি গাছ কাটা হয়েছে। অথচ অবিলম্বে বৃক্ষনিধন বন্ধ না হলে স্থানীয় পরিবেশ ও জনজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। দুই বছর আগেও এসব গাছ কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের প্রবল প্রতিবাদের মুখে তখন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছিল। এবার সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া এবং সড়ক সম্প্রসারণের যুক্তি দেখিয়ে আবার গাছ কাটা হচ্ছে। কিন্তু দুই বছর আগে যে গাছগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানে সেগুলো হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল কীভাবে, সেটি এক বড় প্রশ্ন। বন বিভাগ বলছে, সামাজিক বনায়নের মেয়াদ শেষ হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে গাছ বিক্রি করা হয়েছে এবং সড়ক সম্প্রসারণ করা হবে। পরে আবার গাছ লাগানো হবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হওয়া মানেই কি পরিণত গাছ কেটে ফেলতে হবে? মেয়াদ বাড়ানো বা উপকারভোগীদের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্তের সুযোগ কি নেই? সড়ক সম্প্রসারণের প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি এবং তার জন্য কতটি গাছ কাটতেই হবে, তা কি নিরপেক্ষভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে? স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগও গুরুতর। সুনামগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তারা গাছ কাটার বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন। সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের অনেকে কোনো অর্থ পাওয়া বা গাছ কাটার বিষয়ে জানার কথা অস্বীকার করেছেন। এই অভিযোগ সত্য হলে প্রশ্ন ওঠে, কাদের স্বার্থে এবং কোন প্রক্রিয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? উপকারভোগীদের প্রাপ্য নিশ্চিত করা এবং সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয় ছাড়া এ ধরনের কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও প্রশাসনিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। সুনামগঞ্জ একটি সংবেদনশীল হাওরাঞ্চল। জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে এখানকার মানুষের নিত্য লড়াই।

> ইতিমধ্যে এক হাজারের বেশি গাছ কাটা হয়েছে। অথচ অবিলম্বে বৃক্ষনিধন বন্ধ না হলে স্থানীয় পরিবেশ ও জনজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। দুই বছর আগেও এসব গাছ কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের প্রবল প্রতিবাদের মুখে তখন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়েছিল। এবার সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া এবং সড়ক সম্প্রসারণের যুক্তি দেখিয়ে আবার গাছ কাটা হচ্ছে। কিন্তু দুই বছর আগে যে গাছগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানে সেগুলো হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল কীভাবে, সেটি এক বড় প্রশ্ন। বন বিভাগ বলছে, সামাজিক ..

যে কারণে বিচারক হওয়ার বয়সসীমা ৩৪ হওয়া জরুরি

শামস নজীব
প্রথম আলোর সিনিয়র লিগ্যাল অফিসার

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের (বিজেএস) নিয়োগব্যবস্থা দেশের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ও কঠিন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষাগুলোর একটি। প্রিলিমিনারি, এক হাজার নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মতো একাধিক ধাপ পেরিয়ে একজন প্রার্থীকে সিভিল জজ হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ এখানে মেধা, আইনজ্ঞান, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও বিচারিক সক্ষমতার কঠিন পরীক্ষা রয়েছে।

তবু এই কঠিন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার দরজায় একটি প্রশ্ন সামনে আসেড়৩২ বছর বয়স পেরিয়ে গেলে কি একজন আইন গ্র্যাজুয়েট হঠাৎ বিচারক হওয়ার অযোগ্য হয়ে যান? সম্প্রতি ১৯তম বিজেএস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে আইন গ্র্যাজুয়েট ও প্রার্থীদের মধ্যে যে আলোচনা তৈরি হয়েছে, তা তাই কেবল একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রশ্ন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরকারি নিয়োগে ন্যায্য সুযোগ, রাষ্ট্রের মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও বিচার বিভাগের ভবিষ্যৎ মান।

দেশের মেধার অপচয় রোধের স্বার্থে, হেলথ ক্যাডারের মতো টেকনিক্যাল ক্যাডার সার্ভিস হওয়ায় বিজেএসের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৩৪ বছর করা ও বিসিএসের আদলে বিজেএসে ননুক্যাডার ব্যবস্থা চালু করাড়এ দুটি বিষয় এখন নীতিগতভাবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অবশ্যই বয়স বাড়লেই কেউ ভালো বিচারক হবেনড়এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ৩২ বছর পার হলেই কেউ বিচারক হওয়ার অযোগ্য হয়ে যাবেন, এটিও গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। বিচার বিভাগের নিয়োগনীতির মূল প্রশ্ন হওয়া উচিতড়কে সবচেয়ে যোগ্য, শুধু কে সবচেয়ে কম বয়সী নয়।

৩২ বছর কি যোগ্যতার কোনো জাদুকরি সীমারেখা? একজন প্রার্থী ৩১ বছর ১১ মাস বয়সে বিচারক হওয়ার যোগ্য, কিন্তু ৩২ বছর ১ দিন বয়সে তিনি সেই যোগ্যতা হারাবেনড়এমন ধারণার পেছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিশেষ করে আইন পেশার ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ।

একজন আইনের শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করার পর বার কাউন্সিলের পরীক্ষা, পেশাগত নিবন্ধন ও আদালতে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোভিড়১৯ মহামারি, পরীক্ষা ও নিয়োগে বিলম্ব, দীর্ঘ সেশনজট ও অন্যান্য অনিবার্য বাস্তবতা।

ফলে একজন মেধাবী আইন গ্র্যাজুয়েটের বয়স ৩০ বা ৩১ পেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন হলো, যে সময়ের একটি বড় অংশ প্রার্থীর নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, সেই সময়ের মূল্যও কি তাঁকেই পুরোপুরি দিতে হবে? রাষ্ট্র যদি সরকারি চাকরিতে বয়সসীমা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে থাকে, তাহলে বিচার বিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক।

বয়স নয়, পরীক্ষাই হোক মূল বাছাইয়ের মানদণ্ড

বিজেএস পরীক্ষার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর প্রতিযোগিতামূলক বাছাইয়ের প্রক্রিয়া। একজন প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি, কঠিন লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাহলে ৩৩ বছর বয়সী একজন প্রার্থী যদি একই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৫ বছর বয়সী প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে উত্তীর্ণ হতে পারেন, শুধু বয়সের কারণে তাঁর বিচারিক সক্ষমতা কমে যাবেড়এমন কোনো স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি নেই; বরং আইন পেশার ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতাও যোগ হতে পারে। আদালতে কাজ করা একজন আইনজীবী মামলা পরিচালনা, সাক্ষ্যপ্রমাণ, যুক্তিতর্ক, আদালতের কার্যক্রম ও বিচারপ্রার্থীর বাস্তব সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। অবশ্যই বয়স বাড়লেই কেউ ভালো বিচারক হবেনড়এমন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ৩২ বছর পার হলেই কেউ বিচারক হওয়ার অযোগ্য হয়ে যাবেন, এটিও গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। বিচার বিভাগের নিয়োগনীতির মূল প্রশ্ন হওয়া উচিতড়কে সবচেয়ে যোগ্য, শুধু কে সবচেয়ে কম বয়সী নয়।

বয়সসীমা ৩৪ বছর করার অর্থ এই নয় যে বিচার বিভাগে বয়সের কোনো সীমা থাকবে না; বরং এটি আইন পেশার বাস্তব সময় চক্র এবং বর্তমান সামাজিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সীমা হতে পারে। ৩৪ বছর বয়স পর্যন্ত সুযোগ থাকলে একজন আইন গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়, বার কাউন্সিল ও পেশাগত জীবনের প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়ে আরও পরিণত অবস্থায় বিজেএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। এতে বিচার বিভাগের মান কমবেড়এমন আশঙ্কারও শক্ত ভিত্তি নেই। কারণ, শেষ পর্যন্ত তাঁকে একই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ বয়সসীমা ৩৪ হওয়া মানে যোগ্যতার মান কমে যাওয়া নয়; বরং যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগের পরিধি বাড়ানো।

বয়সসীমার পাশাপাশি আরও একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আনা প্রয়োজন। বিজেএস পরীক্ষায় প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক প্রার্থী অংশ নেন। তাঁদের মধ্য থেকে একটি অংশ প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় সফল হন। আরেকটি অংশ মৌখিক পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সহকারী বা সিভিল জজের পদসংখ্যা সীমিত হওয়ায় তাঁদের সবাইকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এখানেই রাষ্ট্রের সামনে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়।

রাষ্ট্র একটি কঠিন, ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রার্থীদের মেধা যাচাই করল। তাঁদের একটি অংশ মৌখিক পরীক্ষাসহ নিয়োগের প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ পর্যন্ত গিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। কিন্তু পদসংখ্যা সীমিত হওয়ায় তাঁদের একটি অংশকে শেষ পর্যন্ত কোনো সরকারি নিয়োগের সুযোগ ছাড়াই বিদায় নিতে হলো। এটি কি রাষ্ট্রীয় মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার? এখানেই বিসিএসের ননুক্যাডার ব্যবস্থার আদলে বিজেএসেও একটি ননুক্যাডার বা যোগ্য প্রার্থী প্যানেল চালুর চিন্তা করা যেতে পারে। কেমন হতে পারে বিজেএসের ননুক্যাডার ব্যবস্থা? এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে বিজেএসের মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য কোনো সরকারি পদে নিয়োগ দিতে হবে; বরং একটি নির্দিষ্ট 'প্যানেল অব কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেটস' তৈরি করা যেতে পারে। এই প্যানেলে থাকা প্রার্থীদের মেধাক্রম, সংশ্লিষ্ট পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য আইনগত শর্ত যাচাই করে উপযুক্ত আইনভিত্তিক সরকারি পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের আইন কর্মকর্তা, স্বতন্ত্র অ্যাটর্নি সার্ভিস, সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আইন কর্মকর্তা, মানবাধিকার কমিশন কিংবা জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার সংশ্লিষ্ট পদ, সাবরেজিস্ট্রারসহ আইনভিত্তিক বিভিন্ন পদে যেখানে সংশ্লিষ্ট নিয়োগের বিধি অনুমোদন করে, সেখানে এই প্যানেল থেকে প্রার্থী নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

রাত ১০টার পর মেয়েদের কী কাজ? এই প্রশ্নের জবাব

সুচিস্মিতা তিথি
যোগাযোগকর্মী ও লেখক

বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে একই সঙ্গে দুঃখজনক এবং হাস্যকর এমন বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ২০১৯ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য চত্বরে আয়োজিত কনসার্ট। যেহেতু নারীদের হল রাত ১০টায় বন্ধ হয়, সেহেতু সেই কনসার্ট চলার মাঝামাঝি সময়েই আবাসিক নারী শিক্ষার্থীদের হলের উদ্দেশে রওনা দিতে হয়েছিল। নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কনসার্ট সম্পূর্ণটা উপভোগ করে পুরুষ শিক্ষার্থী ও ঢাকায় নিজেদের বাসা থাকা 'প্রিভিলেজড নারী' শিক্ষার্থীরা।

নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশিত আরেকটি কৌতুক হলো এক দিনের জন্য লাল বাসের দোতলায় মেয়েদের বসতে দেওয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নের লাল বাসে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, তাতে এই বিশেষ দিবসের বিশেষ ব্যবস্থাকে কৌতুক না বলে বরং অপমানজনক বলাটাই যথার্থ।

মেয়েদের হলের গেট কেন রাত ১০টায় বন্ধ হয়ে যায়ড়এ নিয়ে তখন আওয়াজ তুলতে গেলে একদল লোক আমাদের বলল, 'এই তো কয় দিন আগেও সাড়ে ৯টায় বন্ধ হতো। তোমাদের কথা ভেবেই তো আমরা ১০টায় করলাম।'

আমরা কৃতার্থ হই।

এমন বাস্তবতায় রাত ১০টায় হলের গেট বন্ধ করে দিয়ে, দেরি করে ফেরা শিক্ষার্থীদের নানা নামে ডেকে, চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে, অশ্লীল তকমা দিয়ে এবং 'খারাপ চরিত্রের অধিকারী' বানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নারীদের ঠিক কী নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, কে জানে?

কারণ, এ কথা সত্যি যে ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের আগেও মেয়েদের হলের গেট সাড়ে ৯টায় বন্ধ হয়ে যেত। সেটিকে রাত ১০টা পর্যন্ত বর্ধিত করা ডাকসুর অর্জন; স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে ডাকসুতে অংশ নেওয়া মেয়েদের হলগুলোর নেতৃত্বের অর্জন।

সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) দৌরাত্ম্যের বিপরীতে মেয়েদের হলগুলোতে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে উঠতে দেখা যায় ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনেই। সে নির্বাচনে একমাত্র রোকেয়া হলেই ভোট জালিয়াতির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। মেয়েরা তালা ভেঙে সিল দেওয়া ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়েছিল। ডাকসুতে একাধিক নারী হলে জিতে এসেছিল স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, কারণ সেসব হলে নির্বাচনে কারচুপি করা কঠিন করে তুলেছিল হলের মেয়েরাই। হলের মেয়েরাই ভোট ডাকাতি করতে দেয়নি।এই মেয়েরাই কয়েক বছর পর চব্বিশের জুলাইয়ে সম্মুখসারিতে থেকে আন্দোলন করেছে। ১৪ জুলাই রাতে থালা-চামচ বাজাতে বাজাতে হলের গেট ভেঙে বের হয়ে হাজারে হাজারে জমায়েত হয়েছে, পলাতক স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার 'রাজাকার' তকমার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছে। বাইরে যখন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্র হাতে নির্বিচারে একের পর এক হামলা চালিয়ে শিক্ষার্থীদের রক্তাক্ত করছিল, তখন এই মেয়েরাই হলের গেটের ভেতর থেকে সন্ত্রাসীদের দিকে স্যান্ডেল তাক করে রেখেছে। মেয়েরাই সর্বপ্রথম হল থেকে ছাত্রলীগকে তাড়িয়েছে, সন্ত্রাসীমুক্ত আবাসিক হলের ঘোষণা করেছে। রোকেয়া হলের মেয়েরাই রাজু ভাস্কর্যে বসে থাকা ছাত্রলীগের দিকে, পুলিশ বাহিনীর দিকে আঙুল তুলে প্রথম 'খুনি, খুনি' স্লোগান দিয়েছে।

এককথায় বলতে গেলে, শেখ হাসিনার বিদায়ের শক্তিশালী ঘণ্টাটি বাজিয়েছে এই মেয়েরাই। ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই মধ্যরাতে হল থেকে বেরিয়ে প্রথম প্রতিবাদ জানান নারী শিক্ষার্থীরাফাইল ছবি : প্রথম আলো

এককথায় বলতে গেলে, শেখ হাসিনার বিদায়ের শক্তিশালী ঘণ্টাটি বাজিয়েছে এই মেয়েরাই। তবু যদি প্রশ্ন করা হয় 'ছেলেদের হলে ২৪ ঘণ্টা প্রবেশ করার সুযোগ থাকলেও মেয়েদের হল কেন নয়?', 'কেন মেয়েরা কোনো কারণে রাত ১০টার বেশি দেরি হয়ে গেলে আর হলে ঢুকতে পারে না?' এর জবাবে মুখ বাঁকিয়ে কেউ কেউ বলে ওঠেন, 'ছেলেরা অনেক কিছু করতে পারে, মেয়েরা পারে না।'

অবশ্য এই ফিরিস্তি মেয়েরা যুগ যুগ ধরেই দিয়ে আসছে। অন্তত ৩০ বছর আগে আমাদের মায়েরা দিয়েছেন। আরও ১৫-২০ বছর আগে আমাদের বড় বোনেরা দিয়েছেন। ১০ বছর আগে আমি এবং আমরা সহপাঠীরা দিয়েছি। এখন আমার জুনিয়ররা দিয়ে চলেছে।

তবে ছেলেদের কাছে কখনো কোনো ফিরিস্তি চাওয়া হয়নি। তারা জন্মগতভাবেই নিরাপত্তা সঙ্গে নিয়ে জন্মেছেন এবং যেকোনো প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টাই হলে প্রবেশের অধিকার রাখেন।

আমার পেশাগত জীবনের সূচনা ঘটে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় একটি ইংরেজি দৈনিকে। তৃতীয় বর্ষে থাকাকালীন আমি সেখানে যোগ দিই ট্রেইনি সাব এডিটর হিসেবে। এটি ছিল পূর্ণকালীন চাকরি। আমি যখন যোগ দিই, তখন নিউজরুমে সবচেয়ে কনিষ্ঠ কর্মীটি ছিলাম আমি। গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ার আগেই যে আমি বাংলাদেশের একটি শীর্ষ ইংরেজি দৈনিকে ফুলটাইম চাকরিতে ঢুকতে পেরেছি, এর পেছনে একটা বড় কারণ হলো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলাম না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই আমি পত্রিকায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ঢাকা লিট ফেস্টসহ বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের প্রকাশনা ও মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছি। এই প্রতিটি কাজের জন্যই আমাকে অধিকাংশ দিন রাত ১১টার পরে বাসায় ফিরতে হয়েছে। প্রায়ই সঙ্গে করে হলে থাকা বান্ধবী, জুনিয়র অথবা সিনিয়রকে আমার বাসায় নিয়ে আসতে হয়েছে, কারণ ততক্ষণে হল গেট তার জন্য বন্ধ।

ফুলটাইম চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ক্লাস, পরীক্ষা ও পড়াশোনাসংক্রান্ত কাজ শেষ করেই আমাকে ছয় ঘণ্টা অফিস করতে হতো। অফিস আওয়ার বিকেল ৪টায় শুরু হলে ছয় ঘণ্টা গুনে শিফট শেষ হতো রাত ১০টায়। অর্থাৎ কোনো হলে থাকা আবাসিক নারী শিক্ষার্থীর পক্ষে আমার জায়গায় এই চাকরি করা কার্যত সম্ভব হতো না।

সপ্তাহে ছয় দিন দুপুর পর্যন্ত ক্লাস এবং রাত ১০টা পর্যন্ত অফিসের শিফট শেষ করে আমি যখন বাসার ফেরার উদ্দেশ্যে অফিসের গাড়িতে উঠতাম, তখন প্রায় প্রতিদিনই আমার সঙ্গে রওনা হতো আমারই সহপাঠী একই পত্রিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। গাড়ি আমাকে নামিয়ে দেওয়ার পর তাকে হলে পৌঁছে দিত। আর হলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার ১১টা বা সোয়া ১১টা তো বাজতই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী নারী হলেও গত ১০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে আমি কোনো নারী নেতৃত্ব দেখিনি। কোনো পত্রিকা বা টেলিভিশন চ্যানেলকেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হিসেবে কোনো নারীকে নিয়োগ দিতে দেখিনি।

কারণটা খুব সম্ভবত এটাই। আবাসিক হলের এই বিধিনিষেধের মধ্যে সংবাদমাধ্যমের মতো ২৪ ঘণ্টার পেশায় যুক্ত থাকা অসম্ভবের কাছাকাছি। এই তো গেল সাংবাদিকতা বিভাগের আলাপ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাট্যকলা বিভাগের নারী শিক্ষার্থীদের কথা বলি। এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ মঞ্চনাটকে কাজ করতে চায়। কারও ইচ্ছা থাকে টেলিভিশনে নিউজ কিংবা প্রোগ্রাম প্রেজেন্টেশনে যুক্ত হবে, যেহেতু একাডেমিক জীবনে তারা প্রেজেন্টেশন স্কিলই ডেভেলপ করে। একটা অংশ নাটক বা সিনেমায় যুক্ত হতে চায়। কেউ কেউ বিদেশি নাটক, সিনেমা, কার্টুন, বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য কনটেন্টে ভয়েস আর্টিস্ট বা ডাবিংয়ের কাজ করে। কেউ কেউ কাজ শুরু করে রেডিওতে।

এই সবকটি ক্ষেত্রেই ক্যারিয়ার গড়তে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবস্থাতেই খণ্ডকালীন কাজ শুরু করতে হয়। এবং নিশ্চিতভাবেই ঢাকা শহরের মতো জ্যামের শহরে রাত ১০টার মধ্যে হলে ঢোকার বাধ্যবাধকতা নিয়ে এই কাজের শিফট শেষ করা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

একই পরিস্থিতিতে পড়তে হয় চারুকলা, সংগীত ও চলচ্চিত্র বিভাগের নারী শিক্ষার্থীদেরও।

বিজ্ঞান অনুষদের আট বিভাগের নারী শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণাকেন্দ্রে কাজ করা নারী শিক্ষার্থীদের দিনের বড় অংশ কেটে যায় ক্লাসে আর ল্যাবে। রাত ১০টার গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের পড়াশোনার জন্য লাইব্